সংবাদ

তারিখ ... 24 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ১ ...

সম্পাদকীয়

প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পড়া ছেড়ে দেয়া

এদেশে নানা ধরনের কর্মসূচি সত্ত্বেও প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের সবাইকে ধরে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির সাম্প্রতিক এক জরিপ থেকে দেখা যাচ্ছে, ভর্তির হার খানিকটা বাড়লেও মাত্র ৪০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শেষ করছে। বাকি ৬০ শতাংশই লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ঝরে পড়ছে, যাকে ইংরেজিতে বলে 'ড্রপ-আউট'। আমাদের দেশে প্রাথমিক শিক্ষার এ সমস্যাটি বহুদিন থেকেই বড় সমস্যা হয়ে আছে। পশ্চিমা দেশগুলোতে 'প্রাথমিক শিক্ষা' চলে স্কুলে আট বছর পর্যন্ত। অনেক অপেক্ষাকৃত কম উন্নত দেশেও আট বছর পর্যন্ত 'প্রাথমিক শিক্ষা' দেয়া হয়। আমরা পাঁচ বছর পর্যন্তও সংখ্যাগরিষ্ঠ শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধরে রাখতে পারছি না।

১৯৯২ সাল থেকে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়। সন্তান-সন্ততিকে স্কুলে না পাঠালে শাস্তির বিধানও রাখা হয়েছে। বিধানটি অত্যন্ত শিথিল ও অকার্যকর। বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির জরিপে বলা হয়েছে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার শতকরা ৮২ থেকে ৮৫ ভাগ। এর মধ্যে উপস্থিতির হার শতকরা ৬০ ভাগ। এখনও দেশে ৬ থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের ১৫ শতাংশ শিক্ষার আলোক থেকে একেবারেই বঞ্চিত। সরকারি হিসাবে বলা হচ্ছে, ১৯৯১ সালে দেশে ছাত্রছাত্রীর ভর্তির হার ছিল ৭৬ শতাংশ। এ সময়ে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার হার ছিল শতকরা ৫৯ ভাগ। অর্থাৎ ১০ বছরে শত শত কোটি টাকা ব্যয় করা হলেও ভর্তির হার সে অনুপাতে বাড়েনি এবং লেখাপড়া ছেড়ে দেয়ার হার কমেনি।

১৯৯১ সাল থেকেই জাতীয় বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়। শিক্ষাখাতে আবার প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়। তার ওপর প্রাথমিক ও গণশিক্ষার দায়িত্বে থাকেন প্রধানমন্ত্রী। শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচিও চালু করা হয়েছিল দরিদ্র পরিবারের সন্তান-সন্ততিদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য। বর্তমানে 'খাদ্য' না দিয়ে নগদ টাকা দেয়া হচ্ছে। কিন্তু ফলাফল এখন পর্যন্ত উল্লেখ করার মতো কিছু নয়; কেননা ঝরে পড়ার হার তো কমছে না। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষাকে 'বাধ্যতামূলক' করার পরও ভর্তির হার কম-বেশি ৮০ শতাংশই থেকে যাচ্ছে। কারণ স্থানীয় পর্যায়ে এসব দেখাশোনা করার কেউ নেই। সব শিশু-কিশোর বিদ্যালয়ে যাচ্ছে কিনা, তা দেখার কথা যাদের তাদের কোন জবাবদিহিতা নেই। সব মিলিয়ে 'সর্বোচ্চ' অগ্রাধিকারের এ খাতটি 'শ্বেতহস্তী' হয়েই থাকল।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রদত্ত সর্বশেষ হিসাবে দেশে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। দু'কোটি শিশুর লেখাপড়ার সুব্যবস্থা করাটা যে সোজা কথা নয়, তা অনস্বীকার্য। কিন্তু তার জন্য বহুদিন থেকেই বিপুল পরিমাণ টাকা-পয়সা খরচ করা হচ্ছে। বিভিন্ন স্তরে লোকজন নিয়োগ করা হয়েছে। নানা ধরনের গবেষণা হচ্ছে। দেশে আবার সাম্প্রতিক বছরগুলোকে মাদ্রাসা শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটেছে। এ শিক্ষা 'প্রাথমিক' শিক্ষার সমতুল্য কিনা, সে বিচারে না গিয়েও বলা যায় যে, মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাথমিক শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে ভুল তথ্য দিচ্ছে। কেননা, সাধারণত দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের এসব প্রতিষ্ঠানে নাম লিখিয়ে সরকারের কাছ থেকে নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা আদায় করা হয়। অথচ ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীদের নগণ্যসংখ্যক লেখাপড়া শেখে। মাদ্রাসাগুলোতে কতজন ভর্তি হয়, তাদের মধ্যে কতজন মাদ্রাসায় যায় এবং কতজন পড়াশোনা শেষ করার আগেই পড়া ছেড়ে চলে যায়, তার আলাদা জরিপ করলে, এ খাতে টাকা-পয়সা খরচ কতটা অর্থবহ বোঝা যেত।

আমাদের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাদের একটাই অজুহাত– গ্রামীণ এলাকার অর্ধেকের বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। তাদের সিংহভাগ আবার একেবারেই হতদরিদ্র। এসব পরিবার সন্তান-সন্ততিদের স্কুলে পাঠাতে চায় না, এমনকি প্রতিমাসে সামান্য ১শ' টাকাও তাদের স্কুলে পাঠাতে আগ্রহ সৃষ্টি করে না। মাঠে কাজ করলে তিন-চার দিনেই শিশুরা ১শ' টাকার বেশি 'আয়' করতে পারে। অর্থাৎ দেশে প্রাথমিক শিক্ষার দৈন্যদশার বড় কারণ হলো দারিদ্র্য। অন্যদিকে শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত থাকাটাও দারিদ্র্যের বড় একটা কারণ। দেশের হতদরিদ্র মানুষেরা এ দুষ্টচক্রে পড়েছে। আর একদিকে বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়ে যারা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কর্মসূচির দায়িত্বে আছেন, তাদেরও খপ্পরে পড়েছে দেশের হতদরিদ্র পরিবারের সন্তান-সন্ততিরা। জনপ্রতিনিধিরা যদি বিষয়টি উপেক্ষা করেন, তবে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিতই থাকবেন।